দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 7 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সাদা-কালো দিনগুলো এবং ঢাকার মেয়র আনিসের কথা

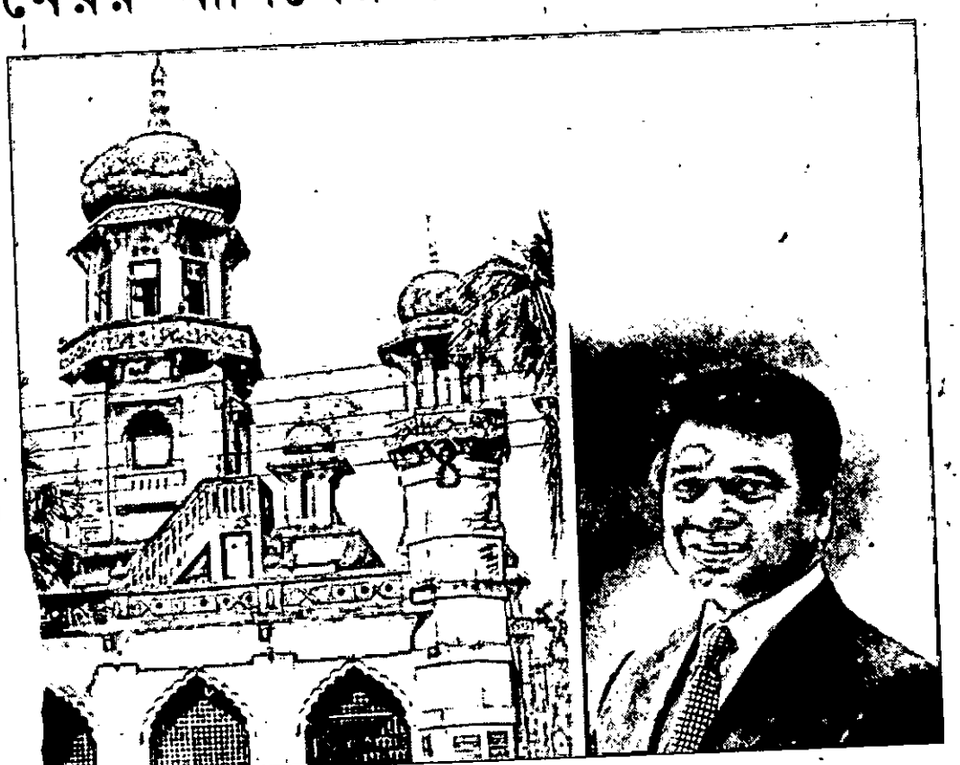

তি সততই সুখের। রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় লেজের শতবর্ষের স্মৃতিচারণ উপলক্ষে লেখিকা তাঁর হপাঠীদের কথা বলতে গিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন মধাবী সহপাঠী আনিসুল হকের কথা। সেই আনিসুল হক বপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে ঢাকা সিটি উত্তরের ময়র। শিক্ষাজীবনে কেমন ছিলেন তিনি জানতে হলে পড়ুন ৬ মে'র পর আজ শেষ কিস্তি

মুক্তিযুদ্ধের উথালপাতাল দিনগুলো যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল সমাজের নানা অংশের মতো আমাদেরও রক্ষণশীলতার ভারি আবরণ। চোখের জল মুছে আমরা ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের কাছে এক সময় বন্ধু হয়ে উঠলাম- আপনি থেকে তুই হলো। কমনরুমের ছোট্ট ঘরটিতে বসাই হয় না বলতে গেলে। ফার্স্ট ইয়ারের ফুল খেলবার দিন পেরিয়ে আমরা সিঁড়িতে বসে আড্ডা মারি সহপাঠীদের সঙ্গে। কলকলিয়ে কথা বলি, লাইব্রেরীতে বই পড়ি দলবেঁধে। কলেজ ফাংশানগুলো এক

শরীফা খন্দকার

সময় উপভোগ করতাম ওপরের ব্যালকনি থেকে। আমরা সে সময় নিচের হলে আসন দখল করেছি শিক্ষক ও ছাত্রদের পাশাপাশি। কলেজে সিনিয়র হওয়াটাও এর কারণ ছিল বৈকি। আনিস নামের সহপাঠী ছাত্রটির সঙ্গে বিশেষত আমার কোনো সাবজেক্টে মিল ছিল না বলে কথাবার্তাও ছিল না। তদুপরি সে কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল আমাদের দু'বছর পর ইকোনমিক্সে অনার্স নিয়ে। কিন্তু আমরা অবাক হয়েই দেখেছিলাম নবাগত অচেনা ছেলেটি কলেজে পা দিয়েই কেমন জয় করে নিল সাহিত্য-সংস্কৃতির মাঠ। ওকে সবাই চিনে ফেলল, প্রিয় করে নিল তার ডিবেটের তীক্ষ্ণতায়, উপস্থিত বক্তৃতার পারঙ্গমতায়। সেইসঙ্গে অসাধারণ কবিতা আবৃত্তি করে সে মুগ্ধ করত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় ও ছাড়া কে আর প্রথম হবে!

মনে আছে কলেজ জীবনের শেষ প্রতিযোগিতার কথাটি। কোন একজন আমাকে টানাটানি করতে লাগল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য। এক সময়ে লাজুক প্রকৃতিরই ছিলাম। জীবনে মঞ্চে খুব বেশি ওঠা হয়নি, তারপর আবার প্রতিযোগিতা! কিন্তু সেবার পা রাখলাম সন্তর্পণে এবং খুব খারাপও করলাম না। অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলাম ছোটগল্প ও কবিতা লেখায় প্রথম হয়ে। আর আনিস তো তার চার ইভেন্টের সবগুলোতেই প্রথম।

মনে পড়ে বাংলা বিভাগের রেজাউল হক স্যারের কথা। পড়াতেন জীবানন্দ দাস- 'পাখীর নীড়ের মত-চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।' সেই সাংস্কৃতিক সপ্তাহের গল্প ও কবিতা বিভাগের প্রধান বিচারক ছিলেন তিনি। কলেজ থেকে বেরোনোর কয়েক বছর কেটে গেছে। স্যার তখন কারমাইকেলের অধ্যক্ষ। কোত্থেকে যেন জেনেছেন আমি একটি সরকারী অফিসে আছি। কারও হাতে পাঠিয়েছিলেন চোখে জল আনা ছোট্ট চিরকুট- 'আমরা ভেবেছিলাম তুমি লেখালেখির জগতে থাকবে।' জানি না স্যার এখন কোথায়!

সে বছর আনিসুল হক বরাবরের মতো চ্যাম্পিয়ন আর আমি রানারআপ।

এ কারণেই কথাটা বলা যে, একসঙ্গে কটা পা চললে যেন বন্ধু হয়! এক্ষেত্রে বোধ হয় বলা ভাল- আমাদের সময় বন্ধু এবং প্রেমিক দুটো সম্পর্ক ছিল ভিন্ন মেরুর। সাহিত্য-সংস্কৃতি সপ্তাহে ওর সঙ্গে শুধু চলা নয়, প্রতিযোগিতার দৌড়েও নেমেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা আজও ভারি আনস্মার্ট মনে হয়- বিজয়ী সহপাঠীকে অভিনন্দন পর্যন্ত জানানোর কায়দাটিও রপ্ত হয়নি সে সময়।

কিন্তু আনিস ও অন্যদের নিয়ে কিছু মণিময় স্মৃতি জমা আছে হৃদয়ের কোঠায়। কারমাইকেল থেকে অনার্স করে পুরো ব্যাচটাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলাম আমরা। সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চায় বলে সে দরজা তখন শক্তভাবে বন্ধ উত্তরবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। রংপুর থেকে দলবেঁধে ট্রেনে করে রাজশাহী যাই একসঙ্গে। সদ্য স্বাধীন দেশে সে সময়ে ট্রেনের দুর্গতি অকল্পনীয়। রেলের ওপর চলেছে বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ। যদিও ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ ব্রিজ তৈরি, লাইন পুনর্স্থাপন, বগি মেরামত ইত্যাদি করে দিয়ে চলাচল উপযোগী করেছে। কিন্তু ওই সময়টিতেও পুরো ট্রেনে সুব্যবস্থা ফেরেনি। আলো-পাখা তো নেই-ই, বিপদ হাতে করে রেলের অমুক ম্যান তমুক ম্যান চালাচ্ছে গাড়ি। কারণ পাকিস্তান আমলে রেলের ড্রাইভার-কর্মচারী সবাই ছিল মূলত অবাঙালী।

রাজশাহী যাওয়ার একটিমাত্র মিটারগেজ ট্রেন সন্ধে ন্যাগাদ রওনা হয়ে যায়- যায় পার্বতীপুর পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার ব্রডগেজ লাইনের ট্রেনে বদলি এবং রাত বারোটার পরে যাত্রা রাজশাহীর দিকে। অন্ধকার সেই ট্রেনের কামরায় মেয়েদের সিটে বসিয়ে বাক্স-পেটরা ওপরে তুলে রেখে আনিসরা কখনই নিজ আসনে বসত না। দরজার দিকে চলে যেত সহপাঠী থেকে ভ্রাতার ভূমিকায়। আমাদের জন্য রাতভর 'দুয়ারে প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত ওরা। সেই দীর্ঘপথ একঠায়ভাবে বসে যেতে পারতাম না আমি। ওদের ফেলে রাখা আসনে গুটিসুটি মেরে শুয়েই পড়তাম চাদরের আড়াল দিয়ে।

পুরো বগিটাই আমাদের। কিন্তু প্রতি স্টেশন বিনা টিকেটের যাত্রী ওঠে। এতগুলো সিট একজনকে দখল করা দেখে তারা দাঁড়িয়ে যেতে রাজি নয়- 'হ্যাঁ, একজন শুয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।'

এক্ষেত্রে লোকাল লোকজনের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া চলে না। বন্ধুদের কেউ একজন দরজা থেকে ছুটে এসে করুণ গলায় বলত- ভাই রোগী নিয়ে রাজশাহী যাচ্ছি। বসিবা ইচ্ছুকজনের বিরক্ত প্রশ্ন- 'কিসের রোগী উনি?' বন্ধুদের কেউ কেঁদে ফেলে এবার- 'ভাই এ রোগী রাজরোগী। জানেন তো- যার হয় যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা।'

সেই মুহূর্তে ছুটন্ত ট্রেনের দরজা থেকে ভেসে আসত এক উদ্বিগ্ন প্রশ্ন এবং কণ্ঠটি আনিস ছাড়া আর কার- 'ওরে তোর কাশিটা কি কমল?' আমার দমফাটানো হাসিকে রূপান্তরিত করতে হতো কাশিতে। পরের স্টেশনেই নিশ্চিত ভেগে যেত অবৈধ যাত্রীদল। এরপর ছুটে যাওয়া ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দ ছাপিয়ে কানে আসত আনিসের অফুরন্ত ভান্ডার থেকে একে একে বের করা হাসির গল্প। একটু ঘুম কি দেব- হাসতে হাসতে সবারই তো পেট ফুটো।

এখনও দেখতে পাই আমাদের নিরাপত্তায় আনিস ও অন্য বন্ধুগুলো সারারাত ধরে নির্ঘুম চোখে ট্রেনের দরজার হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে। ভোরে যখন পৌঁছাতাম রাজশাহী, ওরা পেছনে পেছনে রিক্সা করে আমাদের হলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেত নিজেদের আস্তানায়। পরবর্তীতে আনিসকে টেলিভিশনে দেখেছি, দীর্ঘদিন ধরে তার খবর পড়েছি মিডিয়ায়। কিন্তু মেয়র পদে যখন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল, তখন মেনিফেস্টোতে নজর কেড়েছিল 'নারীবান্ধব' কথাটি। আমরা সেদিনের সহপাঠিনীরা জানি, আনিসের মতো এমন নারীবান্ধব মেয়র আর কে হবে?

সহস্র অভিনন্দন মেয়র আনিস!

আমার কোনো সাবজেক্টে মিল ছিল না বলে কথাবার্তাও ছিল না। তদুপরি সে কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল আমাদের দু'বছর পর ইকোনমিক্সে অনার্স নিয়ে। কিন্তু আমরা অবাক হয়েই দেখেছিলাম নবাগত অচেনা ছেলেটি কলেজে পা দিয়েই কেমন জয় করে নিল সাহিত্য-সংস্কৃতির মাঠ। ওকে সবাই চিনে ফেলল, প্রিয় করে নিল তার ডিবেটের তীক্ষ্ণতায়, উপস্থিত বক্তৃতার পারঙ্গমতায়। সেইসঙ্গে অসাধারণ কবিতা আবৃত্তি করে সে মুগ্ধ করত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় ও ছাড়া কে আর প্রথম হবে!

লেখক : নিউইয়র্ক প্রবাসী লেখিকা
sharifa.k@outlook.com